ছোটগল্প

প্রতীক্ষার কাশফুল

স্বপন মজুমদার

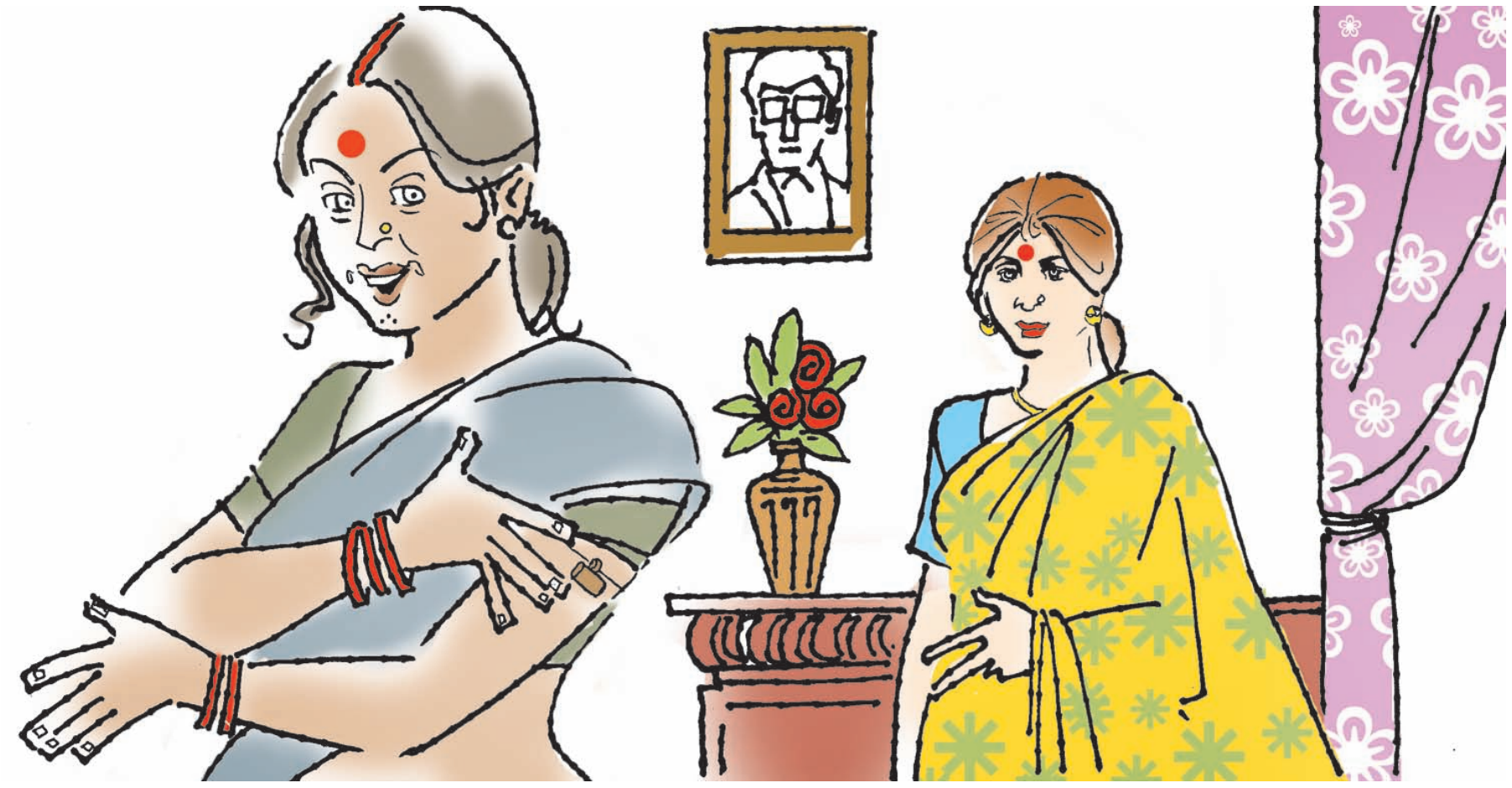

ভোরবেল বাজতেই ঘড়ির দিকে তাকায় রিতা, সাড়ে ন'টা প্রায়। এমন সময়েই বিজয়া আসে।

– যাচ্ছি, কে, বিজয়া?

– হ্যাঁ গো বউদি, আমি।

রিতা ততক্ষণে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়েছে। প্রতিদিনের মতো রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে বিজয়া। বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বিজয়া বলে,

– দাদারে দেখতাছি না যে?

– তার তো অফিসের কাজ, সে তুমি জানোই। ড্রইংরুমে এসে সোফায় বসে রিতা।

– আইজ তো রবিবার গো বউদি। আইজও আপিস?

নিরুত্তর রিতা, সংবাদপত্রের পাতায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিজয়া একটু বেশিই কথা বলে। ছটফটে। ভালোই লাগে রিতার।

– তা হ্যাঁ গো বউদি, বড় পুস্টে চাকুরি কইরলে এমন যাইতেই অয় না বনদের দিনও?

রিতা কোন উত্তর না দিয়ে স্মিত হাসিমুখে তাকায় বিজয়ার দিকে।

প্রতিদিন কাজ শেষে টিফিন, চা খেতে খেতে রিতার কাছে নানা সুখদুঃখের কথা বলা, নতুন কোনও খবর থাকলে তা পরিবেশন করা বিজয়ার অভ্যেস। রিতারও খারাপ লাগে না। ঘণ্টা দেড়েক সময় কীভাবে যে কেটে যায় এবং এই সময়টাই তার বেশ ভালো কাটে। মনে মনে ভাবে রিতা, গরিব ঘরের মেয়ে বিজয়া, কিন্তু কথাবার্তায় তার স্বচ্ছ মনের পরিচয় পেয়েছে প্রথম ক'দিনেই। রাগ অভিমান নেই। হাসিমুখে কাজ করে। কাজও খুব পরিস্কার। বিজয়া চলে গেলে রান্নার পর শুয়ে বসে টিভি দেখা, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনের পাতায় ডুব দেওয়া, দু'টো নাগাদ বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া। রাত ন'টা সাড়ে ন'টায় ঋতব্রত না ফেরা পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটে রিতার।

যখন খুব হাঁপিয়ে ওঠে, চলে যায় মা'র কাছে। প্রায় দু'শো কিলোমিটার দূরে জগদীশপুর। মা ছাড়াও ভাই, ভাই-বউ, ওদের ছোট্ট মেয়ে গুল্লি, সকলের সান্নিধ্যে ভালোই কাটে। কিন্তু দু'তিন দিন যেতে না যেতেই মন উচাটন হয়ে ওঠে। ঋতব্রত কী করছে, কী খাওয়া-দাওয়া করছে এ সব চিন্তা তাকে ঘিরে ধরে। এবং ফিরে আসা।

কথা অন্য খাতে বইয়ে দিতে বিজয়াকে জিজ্ঞেস করে,

– কাল এলে না যে?

কথার কোন উত্তর না পেয়ে বিজয়ার দিকে তাকায় রিতা। বিজয়া মুখ নীচু করে হাসছে মুচকি মুচকি।

– কী ব্যাপার হাসছ যে! রিতার চোখে বিস্ময়।

চা খেতে খেতে হাসি চাপতে গিয়ে বিষম লাগে বিজয়ার। উঠে দাঁড়ায় রিতা, উদ্বিগ্ন সে,

– কী হল, বিজয়া!

বিজয়ার সারা শরীর দুলছে হাসি এবং কাশির দমকে। ঈশারায় মাথা নেড়ে বোঝাতে চায় কিছু হয়নি। ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে বিস্ময়াবিষ্ট রিতা তাকিয়ে থাকে বিজয়ার মুখের দিকে। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। বিজয়া লজ্জা জড়ানো মুখে বলে,

– হেই কথা আর কইওনা গো বউদি, লজ্জা লজ্জা।

– কিসের লজ্জার কথা বলছ?

– আর কও ক্যান, ওই বুড়ির বাপ, ছাইপাশ গিল্লা আইলে তো জ্ঞানগম্যি থাহে না তার। রাত্রে ঘুমটা দিল ভাঙাইয়া। লজ্জা জড়ানো হাসিমুখে বলে, কও দেহি, পাশে মেয়েটা ঘুমাইতাছে, ছি, ছি ছি ছি ছি।

বিজয়ার কথা শুনতে শুনতে বুকের ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করে ওঠে রিতার। মুহূর্তে ঋতব্রতর মুখটা মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। এই রূপ-যৌবন, ঋতব্রত তাকে নিয়ে কোথায় আগ্রহী হবে, ভাবে সে, অথচ তার উদাসীনতার কারণ খুঁজে পায় না রিতা। কোনও কোনও রাতে ঘুম আসতেই চায় না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে। পাশে ক্লান্ত ঋতব্রত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়েছে রিতা। সবসময় তো এত ব্যস্ততা থাকবে না ঋতব্রতর। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে প্রায় দু'দু'টি বছর।

মনটা অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করে ওঠে রিতার। নিজেকে সামলে নিয়ে বিজয়াকে বলে –

– তা তোমার বয়স আর কত, এত স্বাভাবিক। এতে লজ্জার কি আছে। তবে হ্যাঁ, আজ বা কাল ছোটখাটো আর একটা ঘর হলে ভালো হয়।

– ঠিকই কইছো বউদি। লুকজন আইলে কি যে অসুবিদা অয়। দুই এক মাসের মধ্যে ঘর করুম এট্টা চুড়ু কাটো কইরা।

রিতার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে – বউদিগো, তুমি কিন্তুক আমাকে কিছু টেহা দিবা। মাসে মাসে মাইনা থনে কাইট্যা নিবা। বাসনগুলো রাখতে রাখতে বলে –

রিতার দিকে মুখ তুলে বলে – হ্যাঁগো বউদি, একটা কতা কই। কাইল তুমি দুকানে গ্যাছিলা গো, তাই না?

– তুমি দেখলে কোথায়? রিতা জিজ্ঞেস করে।

– না না গো, আমি দেহি নাই। ওই বাড়ির বউদি কইলো তুমারে দ্যাখছে বাজারে।

কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না রিতা।

– কী গো বউদি, আইজ তুমারে এট্টু ক্যামন য্যান লাগতাছে? গুম্ভীর গুম্ভীর। একটু থেমে বলে, রাগ করলা না তো আমার কথায় গো বউদি?

– না না, মুখে হাসি এনে বলে রিতা। সে যখন লাগবে বলবে।

– বিজয়া নিচু গলায় বলে কই কি বউদি, তুমার

বিজয়ার কথা শুনতে শুনতে বুকের ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করে ওঠে রিতার। মুহূর্তে ঋতব্রতর মুখটা মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। এই রূপ-যৌবন, ঋতব্রত তাকে নিয়ে কোথায় আগ্রহী হবে, ভাবে সে, অথচ তার উদাসীনতার কারণ খুঁজে পায় না রিতা। কোনও কোনও রাতে ঘুম আসতেই চায় না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে। পাশে ক্লান্ত ঋতব্রত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন